Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.117-122
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

এক ঝলকে অসমের সংস্কৃতি: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

ড. শিমূল পাল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সতীন্দ্র মোহন দেব কলেজ, লক্ষীপুর, কাছাড়, অসম, ভারত

Abstract:

Assam, a captivating expanse of natural splendour in the northeastern part of India, resembles a meticulously crafted emerald shaped by the voice of a goddess. Abundant in picturesque, naturally beautiful landscapes, the state seems to have been adorned with divine opulence by the hands of God. Throughout history, people have come here in droves, attracted by this enchanting sight and Mamtamayi Assam welcomed everyone and gave them a place in her arms. The combination of various castes and tribes has formed the culture and folk religion of this Mahamilan tirtha. Hence, Assam is an area of diversity in terms of unequal culture. A culture of harmony has been created here due to the coming together of different people from different places. But our cultural fabric, which is meticulously woven over time, is currently under threat from the forces of globalization. The whirlwind of so-called colonial modernity continuously tries to dull, depreciate and remove cultural gems from our heritage. Yet, no matter how much the current of the time tries to remove us from the roots of this culture, we cannot move away because the spiritual country or spiritual culture cannot be forgotten. We shall swim in the current of time but keep our heritage and cultural roots at the centre. Our cultural roots have evolved into a sanctuary, much like a bird's nest. Just as the bird finds solace in its nest at the end of the day, we, too, shall navigate the currents of time, accumulating myriad experiences and ultimately returning to the comforting embrace of our cultural nest.

Keywords: Assam, Diversity, Castes and tribes, Folk religion, Globalization, Colonial modernity, Cultural heritage.

অসম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক চিত্রময় ভূমি। ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তের রাজ্যটি যেন কোনো দেবকন্যার কণ্ঠমালা থেকে খসে পড়া কারুকার্য রচিত একখণ্ড পান্না।নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর রাজ্যটিকে বিধাতা যেন সব ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছেন।সবুজে-শ্যামলে সত্যিই রাজ্যটি উত্তরপূর্ব প্রান্তের এক অপরূপ রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। রাজ্যটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও তার শাখা-প্রশাখা, ছোট-বড় পাহাড়-পর্বত যেন সৌন্দর্যের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।দক্ষিণে মেঘালয়ের পর্বতমালা নীলাভ মেঘসজ্জার মতো শোভা পাচ্ছে। শ্যামল বনরাজি নীলার মেখলাপরিহিতা অসম যেন এক 'বনলতা'। কবির ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ব্রহ্মপুত্র নদ হল এ রাজ্যের কণ্ঠহার আর বরাক নদী হল কটি দেশের কিংকিনী।সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ব্রহ্মপুত্র-বরাকের এই পুণ্য তীরভূমিতে যেন নয়নযুগল শ্যামরূপে বন্দী হয়ে রসলীন ভ্রমরের ন্যায় নিশ্চল হয়ে

যায়। সেই আদিকাল থেকেই অসমের এই মোহময়ীরূপে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ এসেছে এখানে।মমতাময়ী অসম সকলকেই সাদরে গ্রহণ করেছে, আপন কোলে দিয়েছে ঠাঁই।তাই প্রয়াত সুধাকণ্ঠ ড.ভুপেন হাজারিকার গীতটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে:

"মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র মহামিলনর তীর্থ
কত যুগ ধরি আহিছে প্রকাশি
সমন্বয়র অর্থ।"
(মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র - Mahaabaahu Brahmaputra)

এই মহামিলনের তীর্থে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংমিশ্রণে এখানকার সংস্কৃতি ও লোকধর্ম গঠিত হয়েছে।নানা স্থানীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অসম তার লোকধর্ম অভিব্যক্ত করেছে।দুর্গোৎসব, বিহু উৎসব, শৈব-গীত, রামায়ণী গান, রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অসমবাসী তাদের ঈশ্বরের অন্তরোপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছে।এই অনুষ্ঠানগুলিই এখানে লোকউৎসবের রূপ ধারণ করেছে।অসমের সকল শ্রেণীর মানুষ এইসব উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠে।এখানকার লোকধর্মের প্রধান কেন্দ্র হল কামরূপ কামাখ্যাদেবীর মন্দির।মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা দেবী কামখ্যা।কামাখ্যা শক্তিসাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র।আহোম রাজাদের সময়ে এখানে দুর্গা,কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল।কামরূপের এই শক্তিপীঠে দেবী কামাখ্যার পূজাতে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়।পৌরাণিক যুগে প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।যদিও প্রাচীনকালে এখানে আর্যসংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল তবে তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।নাগা, কুকী, মিকির প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির অবদানে অসমের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।সুতরাং ঐতিহ্যগতভাবে অসমের সংস্কৃতি একটি মিশ্রসংস্কৃতি; এই সংস্কৃতির শেকড় প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের অর্থাৎ অস্ট্রোএশিয়াটিক মানুষ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছেছিল।অতএব অসম হল ইন্দো-আর্য এবং অস্ট্রোএশিয়াটিক সংস্কৃতির সমন্বয়স্থল।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে অসম হল একটি উর্বর রাজ্য। এ রাজ্যে নদ-নদী-পর্বত-জঙ্গল-বেষ্টিত জমির মধ্যে প্রচুর ফসল ফলে, যা অতি অল্প পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়। উপরন্তু, অসমের আদ্র জল-বায়ুতে অবসাদ ও আলস্য অনুভূত হয়, যা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস করলে কিছুক্ষণে অনেক বৃদ্ধি পায়। যার ফলস্বরূপ একদল কিছুকাল এ অঞ্চলে বসবাস করার পর অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ত তখন আর একদল এসে এদেরকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিত, আবার আর একদল এসে উপস্থিত হত। এই ভাবে, বিভিন্ন জাতির লোক এই অঞ্চলে বাস করতে আসে এবং একটি মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠে। ১২২৮ সালে আহোমরা এ রাজ্যে আসেন।পরবর্তীকালে আহোমরা অসমীয়া ব্রাহ্মণ ও গণক এবং অসমীয়া কায়স্থদের মতো আরো কিছু ইন্দো-আর্যকে অসমে নিয়ে আসে যার ফলে অসমের সংস্কৃতি দিন দিন বিকশিত হতে থাকে।আমরা বিশ্বাস করি যে অসমীয়া সংস্কৃতি ৭৫০ বছরের ও বেশী সময় ধরে কামরূপের দেশ হিসাবে তার শেকড় গড়ে তুলেছিল।একদা কামরূপের প্রথম ৩০০ বছর মহান বর্মন রাজবংশের অধীনে,২৫০ বছর ম্লেচ্ছ রাজবংশের অধীনে এবং ২০০ বছর পাল রাজবংশের অধীনে ছিল সে সময় ভাষার নানান দিক থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী কারুকার্যের নথি বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়।পরবর্তীতে ১২২৮ সালে যখন শানরা ৬০০ বছরের জন্য অসমে আহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুকাফার নেতৃত্বে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন আবার সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয় এবং এইভাবে অসমীয়া সংস্কৃতির আধুনিক রূপ

বিকশিত হয়।ঠিক একইভাবে, পূর্ব আসমের শুতীয়া রাজ্য, পশ্চিম অসমের কোচ সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ অসমের মধ্যযুগীয় কাছারি ও জয়ন্তিয়া রাজ্যগুলো বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-মিশ্রণে আত্তীকরণের ধাপ সরবরাহ করেছিল৷

শ্রীমন্ত শংকরদেবের অসমের সংস্কৃতিতে অবিস্মরণীয় অবদান আছে।তিনি অসমীয়া সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।বিশেষত বৈষ্ণব আন্দোলন, শ্রীমন্ত শংকরদেব এবং তাঁর শিষ্যদের নেতৃত্বে পনেরো শতকের একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন অসমীয়া সংস্কৃতিকে এক উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছে , যার ফলে শ্রীমন্ত শংকরদেবকে মহাপুরুষ এবং অবতারী পুরুষ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।তাই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবকে অসমের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রূপে গণ্য করা হয়।শংকরদেব বৈষ্ণবীয় ভক্তির আলোকে উপলব্ধি করেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'৷ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।সেই একেশ্বরই স্রষ্টা, ত্রাতা ও সংহার কর্তা।এই মতবাদের ভিত্তিতে শংকরদেব "এক শরণ ভাগবতী ধর্ম" প্রবর্তন করেন।এই ধর্মীয় মতবাদের মূল কথা হলো- শ্রী হরির শরণ নিয়ে তার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে এ সংসারের পাপ-তাপ, জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।তার প্রবর্তিত ধর্মমতে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও জীব হত্যার স্থান নেই।সর্বজীবেই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং তারা সকলেই প্রণম্য।একারণেই তিনি বলেছিলেন-

"কুকুর শৃগাল গর্দভরো আত্মা রাম
জানিয়া সবাকো করিবা প্রণাম"৷৷

(*"কুকুর শৃগাল গর্দভরো আত্মা রাম শংকরদেব - Google Search*)

শংকরদেব ভাগবতের কাহিনি অবলম্বন করে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, বলিছলন ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।এগুলি ছাড়াও তিনি 'ভক্তি প্রদীপ', 'অনাদি পতন', 'ভক্তিরত্নাকর গুণমালা', 'রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে অসমীয়া ধর্ম সংস্কৃতির পথ নির্দেশ করেন।তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহে অসমীয়া জাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও অসমীয়া সংস্কৃতির আদর্শ বর্ণিত হয়েছে। সমবেত কীর্তন ও নাট্যাভিনয়ের পথিকৃৎ তিনি।তাছাড়া 'নামঘর' স্থাপন করা শংকরদেবের আর একটি কীর্তি।তাঁর এসব কাজের ফলে অসমীয়া জনগণ ঐক্যবোধ ও মিলন চেতনায় দীক্ষিত হতে পেরেছে।শংকরদেব অসমে ভক্তি আন্দোলনকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ঠিক সেভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উপমহাদেশের অন্য অনুপ্রাণিত পথ। বৈষ্ণব আন্দোলন চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন, যা 'ভক্তি আন্দলন' নামে ও পরিচিত। তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নদিয়ায় এ আন্দোলন গড়ে ওঠে।বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত চৈতন্যদেবের পূর্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বৈষ্ণব রচনার মধ্য দিয়ে; চৈতন্যদেব এতে নতুন মাত্রা যোগ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়।তখন এর নতুন নামকরণ হয় গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্ম, যা সাধারণ ভাবে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত। কীর্তন বৈষ্ণবধর্মের একটি অন্যতম অংশ।চৈতন্যদেব পদযাত্রাসহ নামসঙ্কীর্তন ও নগরকীর্তন প্রবর্তন করে এতে নতুন মাত্রা যোগ করেন।নব্য বৈষ্ণবধর্মে সুফি ধর্মমতের আশেক-মাশুক তত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য,জিকির বা ভক্তিবাদ এবং সামা নাচ গানের প্রভাব পড়েছিল বলে পণ্ডিতগণ অভিমত পোষণ করেন।ভক্তিভাবাশ্রিত নামসঙ্কীর্তনে বৈষ্ণব আন্দোলন আরও প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়।এ কারণে বৈষ্ণব আন্দোলন "ভক্তি আন্দোলন" নামেও অভিহিত হয়। অসমে ও চৈতন্যদেবের এই ভক্তি আন্দোলনের যে প্রভাব পড়েছিল তা অসমের জনশ্রুতিতে প্রচলিত।অসমের জনশ্রুতিতে ও প্রাচীন

পুস্তকাদিতে শ্রীচৈতন্যের অসম ভ্রমণ, ভাগবত প্রচার, শংকরদেব ও শংকর-শিষ্য দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা তথ্য পাওয়া যায়।আরেকটি তথ্যের কথা ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে বলেছেন ''...শংকরদেবের ধর্ম প্রচার শুরু হবার আগেই শ্রীচৈতন্য আসামের মাটিতে ভক্তিবীজ বপন করেছিলেন, মাধব, দামোদর ও শংকরদেবকে তিনিই ভক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন, এবং আসামের শংকরদেব, তাঁর সম্প্রদায় এবং আসামের বৈষ্ণবধর্ম নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত।"(*Kolkata Durga Puja Festival - শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে স্নেহাশিস মুখার্জির লিখিত একটি সত্যানুসন্ধান মূলক রচনা। ◈ তারেই_খুঁজে_বেড়াই ◈ "উনবিংশ পর্ব" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়*) গৌড়িয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলে মনে করেন। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে পরম সত্ত্বার পূজা প্রচার করেন এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের কাছে 'হরিনাম' মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন।কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, "চণ্ডালহোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"। অর্থাৎ একজন সাধারণ চণ্ডালও "দ্বিজ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন, যদি তিনি হরিভক্তি পরায়ণ হন। "কলিযুগে হরিনাম বিনে গতি নাহি আর"। হিন্দু ধর্মে প্রতিটি মানুষ এ কথায় বিশ্বাস করে।চৈতন্যদেব নামসঙ্কীর্তনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে নব্য প্রেমধর্মে সমান অধিকার দেন।এভাবে তিনি উচ্চ ও নিম্ন বর্গকে অভিন্ন ধর্মাচরণ ও ভাবাদর্শে পরস্পরের কাছে এনে এক হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এ থেকে বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেব এবং শংকরদেব তাঁদের এই ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে সমন্বয়ের সোপান তৈরি করে অসমের সংস্কৃতির এক শক্তিশালী ভিত গড়ে দিয়েছিলেন।

অসমের সাংস্কৃতিক জগতে বেশকিছু উৎসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল বিহু।বিহু অসমের জাতীয় উৎসব।অসমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসব পালন করেন।বিহু মূলতঃ কৃষিভিত্তিক উৎসব।সাধারণতঃ তিন প্রকার বিহু উৎসব অসমে পালিত হয়, এগুলি হল- রঙ্গালী, কঙ্গালী, এবং ভোগালী বিহু।অসমের এই জাতীয় উৎসব প্রকৃতার্থে মিলনের উৎসব।প্রতিদিনের মালিন্য দূর করে, আত্মপরায়ণ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী ত্যাগ করে বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে মানুষ মিলিত হন।তাই বিহু উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কল্যাণ ও সমন্বয়ের উৎসব।'বিহু' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মতবাদ আছে, কিন্তু কোনো মতই সর্বজন গ্রাহ্য নয়।কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত 'বিষুবত' শব্দ থেকে 'বিহু' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।আবার কিছু পণ্ডিতের মতে, বিহু শব্দটির উৎপত্তি চুটিয়াদের 'বিচু' থেকে।এ ছাড়া চুটিয়াদের নিকটবর্তী উপজাতি যেমন মরান, সোনোয়াল, থেঙ্গাল প্রভৃতির মধ্যেও বিহুর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।আহোম রাজার দিনগুলিতেও বিহু উৎসব পালন পরিলক্ষিত হয়েছিল। ঠিক কোন সময় থেকে অসমে বিহুর প্রচলন হয়েছে তা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়।তাই নিশ্চিত করে তার সময় নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।তবে আদিম কৌম সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কার যে এর মূলে রয়েছে সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত।যেহেতু বিহু কৃষি প্রধান সমাজের উৎসব কাজেই ধরিত্রীর উর্বরতা ও সৃষ্টিশীলতার জন্য প্রার্থনাই এর মূল উৎস। বহাগ বিহু বা রঙ্গালী বিহু তিন বিহুর মধ্যে এই উৎসব প্রধান, এই উৎসব অনাবিল আনন্দের উৎসব।অসমের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অনুপম।বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি এখানে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে সকলকে মোহিত করে।এরূপ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উৎসবটি শুরু হয়।রঙ্গালী বিহুর প্রথম দিনটিতে রাত্রি প্রভাতেই স্নানাদি ও পূজা অর্চনা করা হয়।তাছাড়া গৃহপালিত গরুগুলিকেও স্নান ও যত্ন পরিচর্যা করে সাজানো হয়। তাই রঙ্গালী বিহুর প্রথম দিনটিকে 'গো-বিহু'ও বলা হয়।কেননা গরু আর্য

সভ্যতায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।গরু কৃষক জীবনের প্রধান অবলম্বন তাই রঙ্গালী বিহুর আনন্দ-উৎসবের প্রথমেই গরুর পরিচর্যা করা হয়।দ্বিতীয় দিন থেকে নব বস্ত্র পরিধান করে শুরু হয় আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দোৎসব।'হুচরি' গাওয়া এই আনন্দোৎসবের প্রধান অঙ্গ।'হুচরি' শব্দের অর্থ হল ঢাক, ঢোল, বাঁশী,করতাল, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহ সমবেত জনসমষ্টির নাচ গান।এই উৎসবে নৃত্য-সঙ্গীতে যৌবনের বাসনা-কামনার ভাবোচ্ছল প্রকাশ ঘটে।প্রেমের, মিলন-বিরহের নানা পর্যায় এই লোক সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।উর্বরা ও উৎপাদনের প্রাণাবেগপূর্ণ এই বিহু উৎসব অসমীয়াদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের প্লাবন ডেকে আনে। অতঃপর আসে কাতি বিহু বা কঙ্গালী বিহু, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে এই বিহু পালিত হয়।এই বিহুতে আনন্দ-উল্লাস ও ভোগ প্রাচুর্য নেই বললেও চলে।তাই এই বিহুকে কঙ্গালী বিহু বলা হয়। আড়ম্বর-বিলাস কম হলেও এই বিহুটিও তাৎপর্যপূর্ণ।শারদ প্রকৃতির অমলিন স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা কঙ্গালী বিহুর ভাব রূপ।কৃষকের গোলা বা শষ্যভাণ্ডার শূন্যপ্রায় থাকায় এই বিহুতে ভোগ বিলাসের পরিবর্তে একটি আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পায়।কঙ্গালী বিহুতে ভোগ বিলাসিতা না থাকলেও মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুতে কিন্তু তার কোনো খামতি নেই।এই বিহু পৌষ মাসের সৎক্রান্তি দিবসে পালিত হয়।ভোগালী বিহুর সময় 'মেজি' অর্থাৎ কাঠ, খড় ও বাঁশ দিয়ে তৈরি ঘর পোড়ানো এই বিহু পালনের এক বিশেষ অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়।সংক্রান্তির পূর্বের দিন কাঠ, খড় ও বাঁশ দিয়ে যে 'মেজি' তৈরি করা হয় পরের দিন অর্থাৎ বিহু বা সংক্রান্তির দিন ভোরবেলা উঠে যুবক ও বালকগণ স্নান করে এবং ওই মেজিতে আগুন দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।ঘরে ঘরে প্রস্তুত হয় সুস্বাদু আহার- পিঠা, সন্দেশ, নাড়ু, প্রভৃতি।নিজে খেয়ে অন্যদের খাইয়ে অমনি তৃপ্তি লাভ করে সবাই।তাই মাঘ মাসের বিহুর ভোগালী বিহু নাম সার্থক বলা যায়।অসমের এই তিনটি বিহু উৎসব অসমের জনগণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।দুঃখ-কষ্ট ও নানা সমস্যায় জর্জরিত মানব জীবনে সাময়িকভাবে আনন্দ উপভোগের সুযোগ এনে দেয় এই বিহু।তাই সবাই ধর্মীয় ও অন্যান্য বিভেদ ভূলে অসমের সংস্কৃতির এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে।একারণেই অসমের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিহু উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমন্বয়ের উৎসব হিসেবে আজও তার সাক্ষী বহন করে আছে।

স্বল্প পরিসরের এ আলোচনার উপসংহারে এসে আমরা একথাই বলব যে অসম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র।সকল বৈচিত্র্যের অবতারণা করা এ আলোচনায় সম্ভব নয়।তবে একথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে অসংখ্য জাতির মিলনক্ষেত্র হল এই অসম।নানা জায়গা থেকে নানা মানুষ এসে মিলিত হওয়ার কারণে এখানে সৃষ্টি হয়েছে ঐক্যের সংস্কৃতি। তবে, এই সংস্কৃতি এখন কিছুটা বিপন্ন হয়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবে। তথাকথিত বিশ্বায়নজনীত আধুনিকতার ঘূর্ণিঝড় সংস্কৃতির রত্নগুলোর অবমূল্যায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; সরিয়ে দিতে চাইছে আমাদের ঐতিহ্য থেকে।যেখানে ঐতিহ্য তিল তিল করে তৈরি করে মানুষকে; কখনো মনে হয় আমরা সেই ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত আজ।আমরা ভুলে যাই ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আসার আগেও আমাদের একটা দেশ ছিল, ছিল আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি।আমরা মনে করি যে আমাদের মধ্যে মানবতাবাদ একমাত্র ইউরোপীয় 'Enlightment Theory'-ই নিয়ে এসেছে। আসলে এর আগেও আমাদের মধ্যে মানবতাবাদ ছিল।শংকরদেব, চৈতন্যদেব, বুদ্ধ, নানক, কবীর, দাদু, হাছনরাজা- এরা তো এই মানবতাবাদের কথাই বলেছেন,অর্থাৎ সমন্বয়ের সংস্কৃতির কথাই বলেছেন। কালের স্রোত আমদের এই সংস্কৃতির শেকড় থেকে যতই সরিয়ে দিতে চেষ্টা করুক না কেন,আমরা সরে যেতে পারিনা। কেননা আত্মিক দেশ বা আত্মিক সংস্কৃতিকে ভুলা যায় না । কালের স্রোতে আমরা সাঁতার

কাটবো ঠিকই কিন্তু কেন্দ্রে ধরে রাখতে চাইব আমাদের এতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতির শেকড়কে। আমাদের এই শেকড় পাখির নীড়ের মতো হয়ে এসেছে । পাখি যেমন দিন শেষে ফিরে আসে নীড়ে তেমনি আমরাও কালের স্রোতে সাঁতার কেটে হাজার অভিজ্ঞান সঞ্চয় করে সগৌরবে ফিরে আসবো আমাদের এই সংস্কৃতির নীড়ে।অসমের বর্তমান সরকার অসমের সংস্কৃতির গরিমা রক্ষার্থে যথেষ্ট যত্নবান,এটাই আমাদের শ্লাঘার বিষয়।এ আলোচনার ইতিতে এসে একটা কথাই বলবো আমাদের এ আলোচনা সম্পূর্ণ নয়, আপাত পরিশেষ মাত্র। ভবিষ্যতের কোনো আলোচক যদি এই আপাত পরিশেষ থেকে তাঁর আলোচনার ভূমিকার সন্ধান পান, তবেই আমাদের এই আলোচনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

1) গুপ্ত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ: আসামের ইতিহাস, প্রকাশক শ্রীঅনূকুলচন্দ্র ধর, বি. এ. পপুলার এজেন্সি,১৩৩৬, মুক্তরামবাবু ষ্ট্রিট,কলিকাতা ।
2) ঘোষ হাজরা আনন্দ: সাহিত্য বিচারে অবয়ববাদ উত্তরাধুনিকতা ও উপনিবেশবাদ জানুয়ারি, ২০০৮, একুশ শতক, কলকাতা-৭০০০৭৩
3) দাস ড. নারায়ণ, রাজবংশী ড. পরমানন্দ, গোলাপ সূত: অসমর সংস্কৃতি কোষ, মার্চ, ২০০৯, (মুখ্য সম্পাদক, সম্পাদক,সহ সম্পাদক) জ্যোতি প্রকাশন,পাণবাজার, গৌহাটি-১
4) রায় ক্ষিতীশ: আসামের লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, (বাংলা অনুবাদ) ন্যাশনেল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ১৯৮৩, নয়াদিল্লি-১১০০১৬
5) চৌধুরী শ্রী ভূদেব: বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) দে' জ পাবলিশিং॥ কলিকাতা-৭০০০০৯
6) https://www.assam.org/pages/assamese-people-and-their-culture
7) https://www.facebook.com/kolkataDurgaPujaFestival/photos/a.3018191754861445/3249397338407551/?type=3&locale=hi_IN
8) https://www.adotrip.com/bn/state-detail/assam